মেঘনাদবধ : বীররস না করুণরসের কাব্য?

আবহমান বাংলা সাহিত্যে বীররসের কোনো কাব্য নাই। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একটি মাত্র চরিত্র বীররসের আশ্রয়ে বিকাশোন্মুখ হয়েছিল—সে চাঁদ সদাগর, কিন্তু অলৌকিক দৈবশক্তির কাছে তাকেও মাথা নত করানো হয়েছে। আসলে বাঙালীর চারিত্র্য-ধর্মে বীরত্বের প্রাধান্য নেই। মনন-বীরত্ব তার আছে, কিন্তু যে বীরত্ব অসির ঝনঝনায়, জিগীষায় বা রক্তোন্মাদনায়—বিচ্ছিন্ন ভাবে কেউ কেউ তার দৃষ্টান্তে ইতিহাস আলোকিত করলেও, জাতি হিসাবে বাঙালি ইংরেজ বা তুর্কীদের মতো বীরজাতি নয়। অথচ বীররসের প্রতি রয়েছে বাঙালীর নিবিড় আগ্রহ। ভীম-অর্জুনের, কৃষ্ণ-বলরামের বা রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বকথা তারা যুগ-যুগ ধরে শুনেছে। বাঙালীর জাতীয় সত্তার এই বৈপরীত্যই প্রতিফলিত হয়েছে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে।

বাঙালী হিসাবে বীররসের প্রতি আগ্রহ তো ছিলই, তদুপরি দেশ-বিদেশের বীরসরাত্মক মহাকাব্য পড়ে মধুসূদন এ রসের প্রতি আগ্রহী হন আরো বেশি। পাশ্চাত্ত্যে মহাকাব্যকে সাধারণভাবে বলে Heroic tale। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য পাঠের অভিজ্ঞতায় মধুসূদনের মনে এ ধারণা গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না যে মহাকাব্য মানেই বীররসের কাব্য। অবশ্য বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে' তিনি পড়েছিলেন বীররস ছাড়াও শান্ত-শৃঙ্গারাদি রসকে আশ্রয় করে মহাকাব্য রচনা করা যায়। কিন্তু রসের ব্যাপারে তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হোমারের গ্রীক আদর্শ দ্বারা। (স্মরণ্য তাঁর উক্তি : I shall 'write, rather try to write as a Greek world have done.') ইলিয়াড-ওডিসির পাঠ-অভিজ্ঞতা এবং অশৈশব আকর্ষণী রসের প্রতি উৎসাহ বশতই তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের শুরুতেই আপন অভিলাষ ব্যক্ত করে লিখলেন : 'গাইব, মা বীররসে ভাসি মহাগীত'।

আগের—অর্থাৎ প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা'-য় অনুরূপ অভিলাষ ব্যক্ত হয়নি, সেখানে যা বিষয়বস্তু তাতে বীররস উৎসারিত করার সুযোগও ছিল না। এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন মধুসূদন; তাই এবার তিনি বেছে নিলেন যুদ্ধ মুখর ঘটনা এবং রামকে নয়, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপ্য বিষয়কে তিনি এমন করেই পরিকল্পনা করতে চাইলেন যাতে যুদ্ধ ও তার বীরত্বব্যঞ্জক রৌরব মুখ্য হয়ে ওঠার সমস্তরকম সুযোগ পায়। বীররস প্রভাসক ছন্দ তো তাঁর করায়ত্ত ছিলই। অতএব বলা যায়, যা-তিনি অভিলাষ করেছিলেন, তা বাতুল উচ্চাশা না, তার জন্য নিজেকে তিনি সচেতনভাবে প্রস্তুতও করেছিলেন।

কিন্তু আমরা জানি, কাব্যের আবির্ভাবপথ সব সময় কবির সজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে; তবে অধিকাংশেই বলেছেন যে মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনে যেমন প্রায়শঃ সাধ ও সাধিতের মধ্যে সমন্বয় থাকে নি, 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তা-ই; তিনি লিখতে চেয়েছেন বীররসের কাব্য, কিন্তু কাব্যটি হয়ে উঠেছে করুণ রসের।

জীবনের সঙ্গে কাব্যের এই মিল অবশ্যই আকস্মিক, কিন্তু সেই মিলটাকেও স্বীকার করার

আগে আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার করুণরস সত্যিই কাব্যটির অঙ্গীরস—বা মূলরস হয়ে উঠেছে কিনা।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের শুরু হয়েছে বীরবাহুর মৃত্যু-প্রসঙ্গ দিয়ে। ভগ্নদূত আনীত ও দুঃসংবাদে রাবণ মর্মাহত হয়ে পড়েছেন, রাজদুঃখে দুঃখিত হয়েছেন সভাস্থ সকলে। বিস্তর বিলাপের পর মন্ত্রী সারণের সান্ত্বনাবাণীতে কিছুটা শমিত হয়ে তিনি মকরাক্ষের কাছে শুনতে চেয়েছেন বীরবাহুর বীরগতি প্রাপ্তির অনুপুঙ্খ বর্ণনা। ভগ্নদূত বীরবাহুর যুদ্ধকথা এমন ভাবে বর্ণনা করেছে যাতে বিলসিত হয়ে উঠেছে বীররস। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আবার তাকে নীরবে কাঁদতে হয়েছে বীরবাহুর মৃত্যু-কথায়। রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন ও তাঁর সংবেদনায় করুণ রস ও বীররস রয়েছে পাশাপাশি। একই কথা বলা যায় চিত্রাঙ্গদা প্রসঙ্গে। পুত্রশোকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি রাজসভায় এলে 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে', কিন্তু প্রশ্নে-প্রশ্নে রাবণকে যেভাবে তিনি আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করেছেন এবং লঙ্কার এ অবস্থার জন্য তাঁকেই দায়ী প্রতিপন্ন করেছেন, তাতে কারুণ্যকে চাপা দিয়ে বিক্রীড়িত হয়ে উঠেছে বৌদ্ধিক উদ্দীপনা—তথা বীররস। রাবণের আত্ম-জাগরণ ও যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্পও বীররসেরই ব্যঞ্জনাবহ।—এর পর বারুণী-মুরলা-লক্ষ্মীর কথোপকথানদির শান্ত-করুণ সামান্য স্তর পেরিয়ে প্রমোদ কাননে মেঘনাদের বীরোচিত উদ্দীপনা এবং লঙ্কায় এসে পিতার কাছে যুদ্ধযাত্রার—যুদ্ধজয়ের অনুমতি প্রার্থনার ("দুইবার আমি হারানু রাঘবে;/আর একবার পিতা:, দেহ আজ্ঞা মোরে;/ দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!") মধ্যে আবার বীররসের প্রবাহ। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বীর রসের কথা নেই বললেই চলে। সেখানে বৈজয়ন্তধাম থেকে কৈলাস—যোগাসন-চূড়া—আকাশের অসীমতা পার হয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে এসে পৌঁছেছে কাহিনী। তবে 'মেঘনাদবধ'-এ ইন্দ্র-মায়া-পার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীদের যে ভূমিকা, —স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে যে উদ্যোগ ও সক্রিয়তা তা উদ্দীপনাময় বলেই মূলত বীররসাত্মক। —তৃতীয় সর্গ শুরু হয়েছে প্রমীলার চোখের জলে। কিন্তু এ চোখের জল করুণ রসের উৎসার নয়, শৃঙ্গাররসের। সে কাঁদছে বিরহে। লঙ্কাপ্রবেশের সময় তার আচরণে-ভাবনায় আবার দীপ্ত হয়ে উঠেছে বীররস ("দানবনন্দিনী আমি; রক্ষকুল বধূ;/রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,/আমি কি ডরাই, সখি ভিখারী রাঘবে?/পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;/দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?")। নৃমুণ্ডমালিনী এবং অপরাপর চেড়ীদের যুদ্ধোন্মাদনার যে বীররসাত্মক বর্ণনা মধুসূদনের কলমে ফুটে উঠেছে এখানে তার বিকল্প উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। লঙ্কায় মেঘনাদের সঙ্গে প্রমীলার মিলনের পর কিম্বা রাম-বিভীষণদের আলোচনায় ঘটনাধারা বীররস থেকে সরে আসলেও সর্গের উপান্তে কৈলাসে উমা-বিজয়ার কথোপকথনে আবার তা নবায়ত হয়েছে। কিন্তু পার্বতী যখন বলেছেন 'মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,/বিজয়ে; হরিব তেজ: কালি তার আমি' কিম্বা 'অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে/মেঘনাদে!' তখন আবার এসেছে করুণ রস এবং সেটা কৈলাসে প্রমীলার শিবানী-সেবিকা হওয়া কিম্বা মেঘনাদের শিবসেবক হওয়ার কথায় তথা শান্ত রসের সুবাতাসেও বিলোপিত হয়নি।

চতুর্থ সর্গের অঙ্গীরস শান্ত। কিন্তু সীতাহরণের বর্ণনায়, রামের কথা বলতে গিয়ে দুঃখে বারবার সীতার মূর্চ্ছিত হওয়ার বর্ণনায়, জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের সময় সীতার বিপথে

Scanned with CamScanner

পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা ও হতচেতন হওয়ার বর্ণনায় করুণরসের ধারা অভিসিঞ্চিত হয়েছে এ সর্গে। তেমনি জটায়ু কর্তৃক রাবণের পথরোধ ও যুদ্ধের হুঙ্কারে, কিম্বা যুদ্ধের যেটুকু বর্ণনা আছে তাতেও নিঃসৃত হয়েছে বীররস। সীতার স্বপ্নদর্শনে রামের বিজয়যাত্রা, লঙ্কাযুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ-নিধন ('প্রভু মোর, তীক্ষ্মতর শরে,.....কাটিল তাহার শির:!') বর্ণনায়ও বীররসের ব্যঞ্জনা।—পঞ্চম সর্গের নাম 'উদ্যোগ'। সততই বীররস প্রাধান্য পেয়েছে এই সর্গে। দেবী চামুণ্ডার মন্দির-দ্বারে লক্ষ্মণ কর্তৃক মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বানে ('ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে।—/সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!'), কিম্বা মায়ের অনুমতি নিতে মেঘনাদের নিবেদনে ('পাশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!' বা ও পদ-প্রসাদে/চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে/এ দাস।') স্পষ্টতই বীররসাত্মক বানীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেও মন্দোদরীর আশঙ্কা ব্যাকুলতা কিম্বা প্রমীলার আর্ত প্রার্থনায় উৎসারিত হয়েছে করুণ রসের ধারা।—ষষ্ঠ সর্গ লিখে মধুসূদন জানিয়েছিলেন 'It costs me many a tear' এবং সেটা মূলত মেঘনাদের মৃত্যু বর্ণনার জন্য।—

'হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোনিতার্দ্র; থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু!'

মরণকালে মেঘনাদের আক্ষেপ, কিম্বা তার মৃত্যুর পর বিভীষণের দীর্ঘ হাহাকারেও করুণ রসের ধারা দুর্বার। কিন্তু নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের বাগযুদ্ধ কিম্বা আত্মত্রাণে মেঘনাদের যুদ্ধনীতি কথন বা নিছক কোষার আঘাতেই লক্ষ্মণকে হতচেতন করার বর্ণনায় উদ্ভূত হয়েছে বীররস।—সপ্তম সর্গ শুরু হয়েছে মেঘনাদের মৃত্যু-জনিত কারুণ্য দিয়ে। প্রমীলার বাঁ চোখ নাচা, অলঙ্কারে গা ছড়ে যাওয়া, লঙ্কায় রোদনধ্বনি, কৈলাসে মহাদেবের বিষণ্ণতা, মেঘনাদের মৃত্যুর খবর শোনা মাত্র সিংহাসন থেকে রাবণের হতচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া, সভাসদদের আর্তনাদ, শোকে ছিন্নলতার মতো মন্দোদরীর লুটিয়ে পড়া ইত্যাদির বর্ণনায় আকুল হয়ে উঠেছে করুণ রসের ধারা। কিন্তু রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ, রাম-বাহিনীর প্রতিরোধ প্রস্তুতি, সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা ('মরিব, নহে মারিব, রাবণে,/ এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!), যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে রাবণের ভাষণ ('সমরে এবে পশি বিনাশিব/অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট সমরী,/বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—/পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে/ এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই রক্ষোরথি!'), রাবণের ভয়ঙ্করতায় দেবতাদের উদ্বেগ, ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবসৈন্য, কার্তিক, অন্যদিকে রাবণের নেতৃত্বে অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, বাস্কল, উদগ্র প্রভৃতি সেনাপতি ও দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যের আর রামের নেতৃত্বে তাঁর সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রামের বর্ণনা, অবশেষে লক্ষ্মণ ও রাবণের তুমুল লড়াইয়ের বর্ণনায় বীররস এখানে তুঙ্গ পর্যায়ে উন্নীত। কিন্তু মেঘনাদের মৃত্যু-শোক দিয়ে শুরু এ সর্গের পরিণতি লক্ষ্মণের মৃত্যুতে এবং 'পরাভূত যুদ্ধে, মহা অভিমানে/সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।' —এই শোকের আবহ নিয়ে শুরু অষ্টম সর্গের। ভ্রাতৃশোকে রাম ও তাঁর সহায়কেরা শোক-নিথর। এ সর্গে ঘটনা-পটভূমি মর্ত্য থেকে পৌছেঁছে নরকে। সেখানে পাপী-তাপীদের ভয়ঙ্কর শাস্তি ও

তাদের আর্তনাদে করুণ রসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে বারে-বারে। বিস্ময় এবং জুগুপ্সারও অবতারণা করা হয়েছে এই সর্গে। তবে বীররস এ সর্গে অনুপস্থিত।—

কাব্যের অন্তিম তথা নবম সর্গের নাম 'সংক্রিয়া'। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াই এ সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়। এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য রাবণের অনুরোধে প্রতিপক্ষ রাম তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে কথা দিয়েছেন, 'না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি সসৈন্যে।' সততই এরপর এ সর্গে বীররসের কোনো অবকাশই ছিল না। পুত্রহারা পিতার সান্ত্বনাহীন হাহাকার, স্বামীহারা প্রিয়তমার সহগমন—মূর্চ্ছা, রাজ্যের আপামর প্রজাকুলের কান্না—এমন কি রক্ষোকুলের দুঃখে সীতারও অশ্রুপাতে এ সর্গ যেন করুণ রসের পারাবার। কবির অমিত্রাক্ষর-বীণাও যেন বেহাগের লিরিকে বাঁধা—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে—
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!'

কাব্য-কথা শেষও হয়েছে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করে লঙ্কা প্রত্যাবর্তন ও সমগ্রলঙ্কার শোকাতিপাতে—

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রাক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে। আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।"

অতএব, দেখা যাচ্ছে 'মেধনাদবধ' কাব্যের আগাগোড়া আখ্যানে সম্ভাব্য প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মধুসূদন তাঁর অঙ্গীকার মতো বীররসের উৎসমুখ খুলে দিলেও সেই রসধারা—অপরাপর রসধারার মতোই গিয়ে মিলেছে করুণ রসের পরিণতিতে। অতএব, মধুসূদন এ কাব্যের উপক্রমণিকায় কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেননি। পারেননি, কারণ তা পারা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না, কারণ যে কাহিনী বা বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি এ কাব্য রচনা করতে বসেছেন তা এক মহাবীরের বিজয়কাহিনী নয়, নিধন-কাহিনী। অর্থাৎ একাব্যের বিষয়বস্তুই করুণরসাত্মক। এ কাব্যের নামেও রয়েছে তারই ইশারা। 'বধ'—বিশেষত সে যদি স্বয়ং নায়কেরই নিধন হয়, তবে তার ফলশ্রুতি তো করুণ রস হবেই।

আগেই বলেছি, কবির নিজের ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে এ-কাব্যের করুণরসের কোনো সংস্রব নেই। এ কাব্য আখ্যানকাব্য। সাহিত্যধর্মে এ বস্তুলীন। এ কাব্যের রসপরিণতির অনিবার্যতা এর আখ্যানের মধ্যেই নিহিত। মেঘনাদের মৃত্যু-জনিত রাবণের চিত্তাভিঘাত থেকেই উৎসারিত হয়েছে এ কাব্যের বেদনা-বিধুর রসপরিণতি এবং এই পরিণতিকে আবেদনে সুগভীর ও অপরিমেয় করে তুলেছে প্রতিপক্ষ রাম-সীতা-বিভীষণ—এমন কি মহাদেবেরও চিত্তবৈকল্য।

বন্ধু রাজনারায়ণকে একটা চিঠিতে মধুসূদন লিখিলেন, 'You must not, my dear

Scanned with CamScanner

fellow, judge the work as a regular 'Heroic Poem', I never meant as such. It is a story, a tale, rather heroically told. Do not be frightened my dear fellow, I won't trouble my reader with Viraras' (বীররস)।" চিঠিটি পড়ে মনে হয় বন্ধু যেন কিছু একটা আপত্তি তুলেছিলেন এ কাব্যের বীররস সম্পর্কে। সেই আপত্তিরই উত্তর দিয়েছেন মধুসূদন। কাব্যের করুণ রসের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি নিজেই 'I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic," —তাঁর এই সব উক্তিতেই স্পষ্ট, যে অঙ্গীকার তিনি উপক্রমণিকায় করেছিলেন কাব্য-রচনায় এগিয়ে তার প্রতি তিনি প্রতিবদ্ধ থাকেন নি। আখ্যানের নিজস্ব টানই তাঁকে তা থাকতে দেয় নি।

রসাভাসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আখ্যানের সুচারু বিন্যাসে নানা রসের ধারা এসে মেশে, অঙ্গীরস ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে তাদের মিলিয়ে নেয় নিজের নির্বিবাদ ব্যাপ্তির মধ্যে। 'মেঘনাদবধ'-এর অঙ্গীকার করুণ রস; শৃঙ্গার, ভয়ানক, রৌদ্র, শান্ত, জুগুপ্সা, বীর প্রভৃতিতে তার অঙ্গ-সাধনা। অঙ্গরসগুলির মধ্যে বীরের প্রাধান্য অবশ্যই অবিসংবাদী।

ভারতীয় বিধান অনুসারে করুণ রস মহাকাব্যের অঙ্গীরস হতে পারে না। কিন্তু কবি আগেই বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে'র নির্দেশে মানবেন না। দেখা যাচ্ছে, রসপরিণতির ব্যাপারে তিনি তা মানেনও নি। কৃত অঙ্গীকারে নয়, শাস্ত্রীয় বিধানেও নয়, মধুসূদন প্রতিবদ্ধ থেকেছেন কাব্যের স্বাধীন বিকাশে। এতেই কাব্যটি হয়েছে 'গড়ে তোলা' নয়, 'হয়ে ওঠা' বানীশিল্প।

Scanned with CamScanner